উপাসনাধর্মের সমালোচনা কেন?

- অ ন ন্ত -

০৬ মে, ২০০৬

উৎসর্গীকৃত শ্রদ্ধেয় সেতারা হাশেম'কে।

...প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার কাছে অসহায়, ভীত, নিরাপত্তাহীন মানুষের চিন্তায় উপসনাধর্মের সূত্রপাত। কিন্তু ধীরে ধীরে সভ্যতার ক্রমবিকাশের পর এই উপাসনাধর্ম হয়ে দাঁড়ায় মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করার অন্যতম অস্ত্র, শাষন-শোষণ আর ক্ষমতা কাঠামো টিকিয়ে রাখার বড় হাতিয়ার। আজোও যা সারা বিশ্বে বহাল তবিয়তে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ...

এখন এই সকল সামাজিক অসাম্যের কারণগুলি (দুর্নীতি, অশিক্ষা, রাজনীতি) দূর করার পাশাপাশি অ-ব-শ্য-ই উপাসনাধর্মকে আঘাত করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। দরিদ্র, অসহায় মানুষদেরকে বাস্তবমূখী করতে হলে, শাষকগোষ্ঠীর "সেবা পরায়ণতার" মুখোশ উন্মোচন করতে হলে তথাকথিত রহস্যময় মানসিক শান্তির আবরণ সরিয়ে দিতে হবে। তবেই না ওরা সচেতন হয়ে উঠবে, তাদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা গড়ে উঠবে।

(১) সামাজিক বিজ্ঞান (Sociology) এবং নৃবিজ্ঞান (Anthropology)-এর গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি উপাসনাধর্ম উৎপত্তি হয়েছে প্রাচীনকালের আদিম অসহায় মানুষদের অজ্ঞতা, কল্পনা, আর ভয়ভীতি থেকে। যদিও প্রাচীন পৃথিবীর মানব সমাজের শুরুতেই আজকের মতো প্রাতিষ্ঠানিক উপাসনাধর্মের উপস্থিতি ছিল না। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ থেকে পঁচিশ হাজার বছর আগের নিয়ান্ডার্থাল (Neanderthal) মানুষের মধ্যেই সর্বপ্রথম উপাসনাধর্মীয় চেতনা লক্ষ্য করা গেছে, যেমন : আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করে কবর দেয়া, কবরে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি রেখে আসা ইত্যাদি। আস্তে আস্তে সময়ের ধারাবাহিকতায় মানুষের ক্রমবিকাশ ঘটেছে, উপাসনাধর্মীয় চেতনারও বিস্তৃতি ঘটেছে ভিন্ন ভিন্নরূপে। মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ থেকে সমাজবদ্ধ হয়েছে। উপাসনাধর্মীয় চেতনা আত্মার ধারণা থেকে সর্বশ্বেরবাদ, সর্বশ্বেরবাদ থেকে বহুঈশ্বরবাদ-এ মোড় নিয়েছে। অসহায় মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে ভয় ও শ্রদ্ধা করেছে। জল, ঝড়, বৃষ্টি, নদী, সমুদ্র, বন্যা, আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক, আগুন, পাহাড়, অরণ্য, ভূমি ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তুষ্ট করতে চেয়েছে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী সহ নানা গ্রহ-উপগ্রহকে। আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে গৃহপালিত পশু-সম্পদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছে, ভূমি ও নারীর উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছে, উদ্বৃত্ত ফসল গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনে। এ'গুলোই ছিল প্রাচীনকালের মানুষের দেব-আরাধনা'র উৎস। মানুষ কালক্রমে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এই কৃষিভিত্তিক সভ্যতার সুত্রপাত ঘটিয়েছে নারীরাই। কিন্তু কী অদ্ভুত পরিহাস! এই কৃষিভিত্তিক সভ্যতার সময়েই নারীদের ঢুকানো হয় অন্তপুরে। আর এই অন্তপুরে ঢুকানোকে বৈধতা দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় উপাসনাধর্মীয় ফতোয়া। তৈরী হয় তথাকথিত সমাজরক্ষার জন্য, পরিবার রক্ষার জন্য নানা বিধিবিধান। মাতৃপ্রধান সমাজকাঠামো থেকে মোড় নেয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামো-তে (মাতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামো থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামো-তে রূপান্তরের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও কারণ, আমার লেখা "নারী তুমি বিদ্রোহ কর"-এর ২য় পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।)। মাতৃতান্ত্রিক কল্পিত বিভিন্ন দেবীর ধারণারও বিলুপ্তি ঘটে, তৈরি হয় কল্পিত পিতৃতান্ত্রিক ঈশ্বরের ধারণা। ধীরে ধীরে গঠিত হয় রাষ্ট্র। এবং উপাসনাধর্মীয় চেতনা "বহুঈশ্বরবাদ" থেকে বিস্তৃতি ঘটে একেশ্বরবাদ-এ। রাষ্ট্রের একজন

শাষকের রূপ কল্পনা করেই মূলতঃ এই ধরণের চিন্তার বিকাশ ঘটে। একেশ্বরবাদ-এর বিস্তৃতির সাথে সাথে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক ভাবে অবদমিত নারী'র অবস্থান হয় আরোও অধঃস্থন। এই হচ্ছে মোটামোটি খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে উপাসনাধর্মের বিকাশের কথা। বর্তমানে এই পৃথিবীতে খুব কম করে হলেও ছোট বড় মিলিয়ে অর্ধ শতাধিক উপাসনাধর্ম টিকে আছে। অনেকগুলো সময়ের ধারাবাহিকতায় কালের নীচে চাপা পড়ে গেছে কিংবা হারিয়ে গেছে। এই সকল উপাসনাধর্মগুলোর প্রত্যেকটির সাথে যেমন বৈচিত্র রয়েছে, রয়েছে ভিন্নতা, তেমনি রয়েছে কিছু কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো মোটামোটি ভাবে এরকম :- (১) মানুষের চেয়ে শক্তিশালী বা মহত্তর এক বা একাধিক শক্তিতে বিশ্বাস, (২) এই শক্তি বা শক্তিগুলিকে শ্রদ্ধা করা, ভয় করা, প্রার্থনা করা ও তার জন্য উৎসর্গ করা, (৩) এই প্রার্থনা, উৎসর্গ ইত্যাদির জন্য অনুষ্ঠান করা, (৪) কয়েকটি বিশেষ স্থানকে পুজাস্থল ও পবিত্র বলে গণ্য করা, (৫) ধর্মাচরণ করে পৃথিবীতে বা মৃত্যুর পরে উন্নতর জীবন অর্জন করা সম্পর্কিত বিশ্বাস, (৬) শক্তিগুলিকে (দেবতা, ঈশ্বর, আল্লাহ, গড ইত্যাদি) সন্তুষ্ট করার জন্য উপযুক্ত আচার ব্যবহার করা। এখানে উপাসনাধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে নাই। তবু উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, যখন আদিম মানুষের সমাজ ছিলো না, রাষ্ট্র ছিলো না, জীবন ধারণের নিরাপত্তা ছিলো না, খাদ্য যোগানের নিশ্চয়তা ছিলো না, আইন ছিলো না, সর্বোপরি মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ঘটে নি, সেই সময়ই প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার কাছে অসহায়, ভীত, নিরাপত্তাহীন মানুষের চিন্তায় উপসনাধর্মের সূত্রপাত।

> কিন্তু ধীরে ধীরে সভ্যতার ক্রমবিকাশের পর এই উপাসনাধর্ম হয়ে দাঁড়ায় মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করার অন্যতম অস্ত্র, শাষন-শোষণ আর ক্ষমতা কাঠামো টিকিয়ে রাখার বড় হাতিয়ার। আজোও যা সারা বিশ্বে বহাল তবিয়তে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

(২) এককালে উপাসনাধর্ম ছিলো মানুষের কল্পিত আশ্রয়, হতাশ মানুষদের তথাকথিত নিরাপত্তার আচ্ছাদন। কিন্তু আজ যখন আমাদের রাষ্ট্র আছে, আইন আছে, শিক্ষা আছে, আছে মানবিকতাবোধ, সর্বোপরি আছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তাহলে এই উপসনাধর্মের টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনটা কী? প্রাগৈতিহাসিক কালের ধ্যান-ধারণা কী আমাদের আধুনিক কালের জন্য প্রযোজ্য? কেন এর বিলুপ্তির জন্য চেষ্টা করা যাবে না, কেন সমালোচনা করা যাবে না?

> উপসনাধর্মতো গাছ থেকে টুপ করে আমাদের সমাজে পড়ে নি, আমাদের অতীত পূর্বপুরুষের চেষ্টার মাধ্যমেই এই সমাজে বিকাশ ঘটেছে। পরবর্তীতে যা তাদের অর্থনৈতিক শোষন, শাষণ, ক্ষমতাকাঠামো টিকিয়ে রাখতে যুগ যুগ ধরে সাহায্য করেছে। তাই একে দূর করতে হলে আমাদের স-বা-র-ই সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার।

কোনো প্রকার সচেতনতাবোধ সৃষ্টি ছাড়া, সমাজে উপাসনাধর্মের অপ্রয়োজনীয় দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ ছাড়া, এর ভ্রান্তিসমূহ, অপবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণাসমূহ জনগণের কাছে তুলে ধরা ব্যতিত উপাসনাধর্মের বিলুপ্তি ঘটবে, এমনটা আমরা কখনওই মনে করি না। আর যারা জেনেশুনে এধরণের বক্তব্য প্রদান করে থাকেন, তাঁদেরকে খুব ভদ্র ভাষায় বললে বলা যায়, তাঁরা বোকার স্বর্গে বাস করেন। কিংবা তাঁরা কাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলছেন, সেটা পরিষ্কার।

(৩) উপাসনাধর্মের সমালোচনা করতে গেলে বা এর ভ্রান্তি চিহ্নিত করতে গেলে কিংবা এর বিলুপ্তির প্রচেষ্টা চালালে সর্বপ্রথমেই যে বক্তব্য উঠে আসে (এই ধরণের বক্তব্য সাধারণতঃ প্রদান করে থাকেন

রক্ষণশীল মানসিকতা, প্রথাবদ্ধ চিন্তার অধিকারী, কিংবা যারা পরিবর্তন সহ্য করতে পারেন না।), তা হলো-"জনসাধারণের (উপাসনা) ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত করা যাবে না।" বড় বিচিত্র এই উপসনাধর্মীয় অনুভূতি!! (মজার ব্যাপার হচ্ছে- একটি উপাসনাধর্মগ্রন্থ অন্য উপাসনাধর্মগ্রন্থকে স্বীকার করে না, বিশ্বাস করে না, প্রচন্ড বিরোধিতা করে থাকে, এক উপাসনাধর্মের মানুষ অন্য উপাসনাধর্মের মানুষকে উপাসনাধর্মহীন বলেই গণ্য করে থাকেন)। যুক্তির খাতিরে মেনে নিচ্ছি অন্যের উপাসনাধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা অন্যায়। কিন্তু সকল উপাসনাধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে বা এর নানা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির কারণে যে আমাদের নাস্তিকীয় অনুভূতি-তে প্রতিনিয়ত আঘাত করে চলছে, এটা কী অন্যায় নয়? না কি, নাস্তিকদের কোনো অনুভুতি নেই বা থাকা উচিৎ নয়? যা হোক, এই ধরণের তথাকথিত উপাসনাধর্মীয় অনুভুতি প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদ "**ধর্মানুভূতির উপকথা**" গ্রন্থে (আগ্রহীরা মুক্ত-মনা'র আর্কাইভ থেকে প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন : http://www.mukto-mona.com/Articles/humayun_azad/Dharmanubhutir_Upakatha.pdf) বেশ সুন্দর করে সুনির্দিষ্ট কিছু মন্তব্য করেছেন, যা প্রণিধানযোগ্য :-

> "..... মানুষ বিশ্বকে অনুভব করে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য; ইন্দ্রিয়গুলো মানুষকে দেয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শ্রুতির অনুভূতি; কিন্তু মানুষ, একমাত্র প্রতিভাবান প্রাণী মহাবিশ্বে, শুধুমাত্র এ পাঁচটি ইন্দ্রিয়েই সীমাবদ্ধ নয়, তার আছে অজস্র ইন্দ্রিয়াতীত ইন্দ্রিয়। তার আছে একটি ইন্দ্রিয়, যার নাম দিতে পারি সৌন্দর্যেন্দ্রিয়, যা দিয়ে সে অনুভব করে সৌন্দর্য; আছে একটি ইন্দ্রিয়, নাম দিতে পারি শিল্পেন্দ্রিয়, যা দিয়ে উপভোগ করে শিল্পকলা; এমন অনেক ইন্দ্রিয় রয়েছে তার, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রবল প্রখর প্রচন্ড হয়ে উঠেছে তার ধর্মেন্দ্রিয়, যা দিয়ে সে অনুভব করে ধর্ম, তার ভেতরে বিকশিত হয় ধর্মানুভূতি, এবং আজকের অধার্মিক বিশ্বে তার স্পর্শকাতর ধর্মানুভূতি আহত হয়, আঘাতপ্রাপ্ত হয় ভোরবেলা থেকে ভোরবেলা। অন্য ইন্দ্রিয়গুলোকে পরাভূত ক'রে এখন এটিই হয়ে উঠেছে মানুষের প্রধান ইন্দ্রিয়; ধর্মেন্দ্রিয় সারাক্ষণ জেগে থাকে, তার চোখে ঘুম নেই, জেগে জেগে সে পাহারা দেয় ধর্মানুভূতিকে, মাঝে মাঝেই আহত হয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে, বোধ করে প্রচন্ড উত্তেজনা। এটা শিল্পানুভূতির মতো দুর্বল অনুভূতি নয় যে আহত হওয়ার যন্ত্রণা একলাই সহ্য করবে। এটা আহত হলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ধর্মানুভূতির উত্তেজনা ও ক্ষিপ্ততায় এখন বিশ্ব কাঁপছে। .....।"

এরপর তিনি আরো একটু ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

> ".....পৃথিবীতে সম্ভবত এখন বিশুদ্ধ ধার্মিক নেই, থাকলে তাদের ধর্মানুভূতি খুবই আহত হতো। যেমন, মন্দির দেখে আহত হ'তে পারে একজন ধার্মিক মুসলমানের ধর্মানুভূতি, কেননা তার বিশ্বাসের জগতে মন্দির থাকতে পারে না; আবার মসজিদ দেখে আহত হ'তে পারে একজন ধার্মিক হিন্দুর ধর্মানুভূতি, কেননা তার বিশ্বাসে মসজিদ অবাঞ্ছিত। একজন খাঁটি মুসলমান যদি দাবি করে যে, মন্দির দেখে তার ধর্মানুভূতি আহত হয়েছে, তাই মন্দিরটিকে নিষিদ্ধ করতে হবে, তখন রাষ্ট্র কী করবে; একজন খাঁটি হিন্দু যদি দাবি করে যে মসজিদ দেখে তার ধর্মানুভূতি আহত হয়েছে, তখন কী করবে রাষ্ট্র? খাঁটি ধার্মিকের কোমল ধর্মানুভূতি আহত হ'তে পারে প্রতিমুহূর্তেই; টেলিভিশন, সিনেমা, বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের, সংসদে নারীদের দেখে আহত হ'তে পারে তার ধর্মানুভূতি, এবং সে এসব নিষিদ্ধ করার জন্যে আবেদন জানাতে পারে। পৃথিবী এবং গ্রহগুলো ঘোরে সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে, মহাবিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে "বিগ ব্যাং" বা মহাগর্জনের ফলে, সেটি হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে আজ থেকে একহাজার থেকে দু-হাজার কোটি বছর আগে, তারপর থেকে সম্প্রসারিত হয়ে চলছে, সূর্য আর গ্রহগুলো উদ্ভূত হয়েছে সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে, মানুষ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে আসে নি, বিবর্তনের ফলে বিকশিত হয়েছে বিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ বছর আগে, পাহাড়গুলো পেরেক নয় ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক সত্য বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়;- এগুলোতে প্রচন্ডভাবে আহত হ'তে পারে ধার্মিকদের ধর্মানুভূতি, তারা এগুলো নিষিদ্ধ করার দাবি জানাতে পারে। তখন রাষ্ট্র কী করবে? রাষ্ট্র কী নিষিদ্ধ করবে বিজ্ঞান? তারপর ধর্মানুভূতি সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক,

তাই তা কতোটা আহত হলো, তা পরিমাপ করা উপায় নেই। যুক্তি দিয়ে অযুক্তিকে মাপা যায় না। .....।"

বলা যায়, জ্ঞান বিকাশের অর্থই হচ্ছে উপাসনাধর্মীয় নামক হাস্যকর, নিরর্থক, অযৌক্তিক অনুভূতিকে, পৌরাণিক বিশ্বাসকে আহত ক'রা, শুধু আহত নয়, সেগুলোকে সম্পুর্নরূপে বাতিল করা।

আমরা জানি, অন্ধ উপাসনাধর্মানুভূতি বিস্তারের পেছনে কাজ করে দারিদ্র, অশিক্ষা, দুর্নীতি ও রাজনীতি। দরিদ্রের শিক্ষা লাভের সুযোগ নেই, তার জ্ঞান আহরোণের সব এলাকাই অজানা। ফলে জ্ঞানহীন মনের ভেতরে সহজেই সংক্রমিত করতে পারে অযুক্তি ও অপবিশ্বাস; এরই মধ্যে সে খুঁজে নেয় শান্তি ও শক্তি। সে ভেবে নেয়, তার সাথে কিছু নেই বলে রয়েছে এক অলৌকিক মহাশক্তি, যা তাকে বাস্তবে কিছুই দেয় না, শুধু মানসিকভাবে সবল করে রাখে।

এখন এই সকল সামাজিক অসাম্যের কারণগুলি (দুর্নীতি, অশিক্ষা, রাজনীতি) দূর করার পাশাপাশি অ-ব-শ্য-ই উপাসনাধর্মকে আঘাত করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। দরিদ্র, অসহায় মানুষদেরকে বাস্তবমূখী করতে হলে, শাষকগোষ্ঠীর "সেবা পরায়ণতার" মুখোশ উন্মোচন করতে হলে তথাকথিত রহস্যময় মানসিক শান্তির আবরণ সরিয়ে দিতে হবে। তবেই না ওরা সচেতন হয়ে উঠবে, তাদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা গড়ে উঠবে।

(৪)বর্তমানে আমাদের এ পৃথিবী, মহাকাশ, মহাবিশ্বসহ সবকিছুর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য আজ আর 'ঈশ্বর' নামক কোন অনুকল্পের প্রয়োজন নেই। যদিও বিজ্ঞান আজো সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারছে না কিন্তু ধীরে ধীরে সে বিকশিত হচ্ছে। প্র-ব-ল ভা-বে-ই। এই মহাবিশ্ব কীভাবে উৎপত্তি হয়েছে কিংবা "প্রথম কারণ" বলে কোনো কিছু আছে কি না, আমি সে দিকে যাচ্ছি না। আমার মুল কথা হচ্ছে, প্রচলিত উপাসনাধর্ম বা এদের তথাকথিত পবিত্র গ্রন্থসমূহ যে ধরনের ঈশ্বর (ভগবান, আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি) নামক আবছায়া রূপ, আধোভৌতিক ব্যক্তিসত্ত্বার বহিঃপ্রকাশ দেখাচ্ছে তা তো সর্বৈব মিথ্যে। (সত্য কে সত্য আর মিথ্যে কে মিথ্যে বলা যাবে না?) কেননা সকল উপাসনাধর্মের গ্রন্থসমূহ পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব, অপবৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ভ্রান্ত ধারণা, অনুমানসর্বস্বের উপর রচিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় :- বেদ, বাইবেল, আলকোরান প্রভৃতির বর্ণিত তত্ত্ব মতে এই মহাবিশ্বে পৃথিবী স্থির, সমতল। কিন্তু আসলেই কী তাই, আজকের বিজ্ঞান কী বলে? আবার প্রথম মানব মানবী আদম-হাওয়া, হযরত নূহঃ বা মনু'র মহাপ্লাবণ নিয়ে গালগল্প প্রচার করে চলছে। আবার ছয়দিনে বিশ্বসৃষ্টি'র মতো অজস্র ভুল তত্ত্ব সম্পর্কিত উদাহরণ রয়েছে।

তাহলে যে উপাসনাধর্মগুলো মিথ্যে তথ্য, তত্ত্ব পরিবেশন করছে, আমাদের আপামর জনসাধারণের মধ্যে ভ্রান্ত জ্ঞান যুগ যুগ ধরে ছড়িয়ে দিয়ে আসছে; এই ভ্রান্তজ্ঞান রোধ করার চেষ্টা করা কী অন্যায়? এর সমালোচনা করা যাবে না কারণ কী শুধুমাত্র মানুষের উপাসনাধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত লাগবে বলে?

তাহলে প্রশ্ন করতে হয়, এই ধরণের মিথ্যে তথাকথিত অনুভুতি ধারণ করে রাখার প্রয়োজনটা কী? যে সকল তথাকথিত অনুভূতি মানুষের জ্ঞানের প্রসারে, বিকাশে বাধা দেয়, তাকে ধারণ করে রাখার কোন প্রয়োজন আছে বলে আ-মি মনে করি না।

(৫) সবগুলো উপাসনাধর্ম সোচ্চারে ঘোষনা করে থাকে, তাঁদের পবিত্র গ্রন্থ হচ্ছে সর্বজ্ঞানের আকর খনি। এই বিশ্বকে জানতে হলে, সমাজে বসবাস করতে গেলে, জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের গ্রন্থের কোনো বিকল্প নাই। কিন্তু "জ্ঞান" বলতে আমরা কী বুঝি। জ্ঞানের শর্তই বা কী কী? যে কেউ যদি বলেন বা দাবি করে বসেন, আমার অমুক বিষয়ে জ্ঞান আছে, তাহলেই কী আমরা ঐ ব্যক্তিকে জ্ঞানী বলে ধরে নেব? এ প্রসঙ্গে আমি একটু বিস্তারিতভাবে লেখক দেবব্রত রপ্তান-এর বক্তব্য (উৎস : মৌলবাদ ও বিশ্বায়ন; দেবব্রত রপ্তান; প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০২, প্রকাশনায় : র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন, কলকাতা-৭০০০০৯। পৃষ্ঠা- ৭-৮) তুলে ধরছি :-

".....কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে "জ্ঞান" আছে, এই দাবি করতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ অবশ্যই প্রয়োজন। **প্রথম শর্ত হল, ওই ব্যক্তির দাবির বা বিবৃতির বিষয়টি অবশ্যই 'সত্য' হতে হবে**। তাহলে 'সত্য' কি? 'সত্য' বলতে বোঝায় বিষয়টি বা বস্তুটি আসলে যা, তার সাথে দাবিটির বা বিবৃতিটির হুবুহু মিল থাকতে হবে। আর অমিল ঘটলে তা মিথ্যে হবে। "মিথ্যা জ্ঞান", জ্ঞান নয়। জ্ঞান মাত্রই সত্য। যেমন- পোপ অষ্টম গ্রেগরি দাবি করলেন- তাঁর সৌরজগতের জ্ঞান আছে এবং সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। গ্রেগরির এই দাবি "জ্ঞান" বলে গণ্য নয়। কারণ, সৌরজগতের ঘটনার সাথে এর কোন মিল নেই। কিন্তু কোপারনিকাস বললেন- তাঁর সৌরজগত সম্পর্কে জ্ঞান আছে এবং পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। কোপারনিকাসের এই দাবি "জ্ঞান" বলে গণ্য হবে। কারণ, সৌরজগতের ঘটনার সাথে এর মিল আছে অর্থাৎ এটি 'সত্য'। তবে কোন দাবি বা বিবৃতি সত্য হলেই ওই বিষয়ে জ্ঞান ছিল বলে তা বলা যাবে না। কারণ এমনও হতে পারে, ঐ ব্যক্তি নিছক আন্দাজে এ ধরণের দাবি করেছিলেন। যেমন- রামলালের ছেলে শ্যামলাল বলল- ২০০৩ সালের ৩রা জানুয়ারি কোলকাতায় প্রবল বৃষ্টি হবে এবং দেখা গেল ওই সালের ওই দিনে কোলকাতায় সত্যই প্রবল বৃষ্টি হল। তা হলেও এই দাবি জ্ঞান বলে গণ্য নয়। কারণ, **জ্ঞানের দ্বিতীয় শর্তটি পূরণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তা হল ওই ব্যক্তির দাবির প্রতি 'বিশ্বাস' থাকতে হবে**। বিশ্বাস নেই অথচ ওই বিষয়ে জ্ঞান আছে, এমন দাবি স্ববিরোধ দোষে দুষ্ট। তবে কোন বিষয়ে বিশ্বাস থাকলেই তা জ্ঞান বলে গণ্য নাও হতে পারে। কারণ সেখানে সত্যতার অভাব ঘটতে পারে। যেমন - গড্‌ম্যান চন্দ্রস্বামী দাবি করেছিলেন- " আমার বিশ্বাস আমাকে সরকার বন্দী করায় আমার আরাধ্য দেবতা পাথুরে গণেশ পৃথিবী জুড়ে দুধ পান করেছেন।" এখানে 'বিশ্বাস' আছে, কিন্তু 'সত্যতা' নেই। তাই এটি 'জ্ঞান' নয়। তবে সত্যতা আর বিশ্বাস থাকলেই কি 'জ্ঞান' হবে? না। **জ্ঞানের তৃতীয় শর্তটি আরও জরুরী, তা হলো, ওই ব্যক্তিকে বিষয়টির সত্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত যুক্তি, সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে হবে**। এ প্রসঙ্গে অনেক অনেক বছর আগেরকার একদিনের একটি ঘটনার উল্লেখ করবো, যে দিনটি পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের জন্মদিন হিসাবে গণ্য করা হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৫ অব্দ। সেদিন সকাল থেকে গ্রীসের মিলটাস শহরে হঠাৎ সোরগোল পড়ে গেল। ছেলে-বুড়ো এমনকি মা-ঠাকুমারাও ঘর ছেড়ে রাস্তায় ভিড় জমালো। কাজকর্ম ফেলে সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। সবার মুখে একটাই প্রশ্ন- ব্যাপারটা কি? ভিড়ের মাঝে কে যেন বলে উঠল- ব্যাপার! ওই যে কি যেন নাম লোকটার- থ্যালিস্! থ্যালিস্! লোকটা পুরোহিত নয়। তবে মস্ত বড় পন্ডিত। তিনি আঁক-জোক করে হিসেব ক'ষে অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছেন- আজ নাকি সূর্যগ্রহণ হবে। সন্দেহের দোলা আর কৌতুহলে আবিষ্ট কয়েক জন একসাথে বলে উঠলো - হুঁ! [পুরোহিতদের চেয়েও পন্ডিত! কত পুঁথি পড়েছেন তিনি? দেশ-বিদেশের বড় বড় পন্ডিত পুরোহিতের দল সকল শাস্ত্র ঘেঁটে বলেই দিয়েছেন- গ্রহণের কোন দিন ক্ষণ নেই। এটা অলৌকিক ব্যাপার। অন্ধকারের এক ভয়ঙ্কর অপদেবতা আলোর দেবতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রাস করে সূর্যদেবতাকে। তখন পৃথিবীর বুকে নেমে আসে এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার। তারপর মর্তবাসীদের ঝাঁজর, কাঁসর, ঘন্টা-ধ্বনি শুনে, পুরোহিতদের পূঁজাপাঠ, মন্ত্রউচ্চারণে তুষ্ট হয়ে অন্ধকারের দেবতা একসময় সূর্যদেবতাকে মুক্তি দেয়। তখন গ্রহণ শেষ হয়। ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠলো - না, না। লোকটা আঁক-জোক ক'ষে শুধু গ্রহণের দিনক্ষন জানানি। সেই সাথে তিনি দিয়েছেন, অকাট্য যুক্তি আর সাক্ষ্য-প্রমাণ (জ্ঞানের তৃতীয় শর্ত)। তিনি জানিয়েছেন, গ্রহণ কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়। দেবতা-অপদেবতার লড়াইও নয়। এটা সম্পূর্ণ লৌকিক ঘটনা। আকাশের চাঁদটা যখন সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে, তখন চাঁদের ছায়া পৃথিবীর বুকে যে অংশে পড়ে সেই অংশের মানুষেরা কিছুক্ষণ সূর্যকে দেখতে পায় না। তখন হয় সূর্যগ্রহণ।

> থ্যালিস্ পুরোহিত নন। থ্যালিস্ হলেন বিজ্ঞানের জন্মদাতা, পাশ্চাত্যের প্রথম বৈজ্ঞানিক।
>
> তাহলে বোঝা গেল? বেদ-পুরাণ-বাইবেল-কোরান যে অপৌরেষেয় আপ্তবাক্য প্রচার করে; যত পোপ-পাদ্রী-অবতার-অবধূত-বাবা ও ব্রহ্মচারী নিজেদের জন্মসিদ্ধ, বাক্‌সিদ্ধ বয়েল দাবি করেন এবং অন্ধ ভক্তদের জন্য ভুড়িভুড়ি মিথ্যা ধর্মীয় বাণী প্রচার করেন, জ্ঞানের মাপকাঠিতে বিচার করলে তা জ্ঞানই নয়। তারপর তো তার বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হওয়ার প্রশ্নই রয়েই যায়। সে তো শতেক যোজন দূর!.....।"

উপরের বর্ণনা থেকে দেখতে পাই, জ্ঞানের তিনটি শর্ত রয়েছে - (১) বিষয়টি সত্য হতে হবে, (২) বিশ্বাস থাকতে হবে, (৩) দাবিদারকে অবশ্যই বিষয় সম্পর্কে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে। এখন উপাসনাধর্মীয় গ্রন্থগুলো যে ধরণের ভক্তিরসে আপ্লুত বাণী প্রচার করে চলছে, তাকে কী "**জ্ঞান**" বলা চলে? কী বলেন আপনারা? অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া আর অনুমানসর্বস্ব বক্তব্যকে কেন আমরা জ্ঞান বলে গ্রহণ করে ভ্রমের শিকার হবো?

> এখন উপাসনাধর্মীয় গ্রন্থগুলো যে ধরণের ভক্তিরসে আপ্লুত বাণী প্রচার করে চলছে, তাকে কী "**জ্ঞান**" বলা চলে? কী বলেন আপনারা? অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া আর অনুমানসর্বস্ব বক্তব্যকে কেন আমরা জ্ঞান বলে গ্রহণ করে ভ্রমের শিকার হবো?

মাঝে মাঝে নানা জনের কাছ থেকে প্রশ্নের উদয় হয়, পৃথিবীতে এতো প্রজাতি থাকতে কেন শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই উপাসনাধর্মের বিস্তৃতি ঘটলো? যদিও এ নিয়ে উপাসনাগ্রন্থগুলোতে নানা মজাদার কৌতুকপূর্ণ গালগল্প রয়েছে। কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে, মানব মস্তিষ্কের যে অংশ চিন্তাভাবনা ও কথাবলা নিয়ন্ত্রন করে সেই ফ্রন্টাল ও টেম্পোরাল লোবের আয়তন মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ থেকে অস্বাভাবিক রকম বিশাল- যার জন্য মানুষ অনেক আকাশ-পাতাল চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। ঐ চিন্তা-ভাবনার সাহায্যে মনে মনে অজস্র কাল্পনিক ছবি আঁকতে পারে। কিন্তু ঐসকল চিন্তা-ধারা যদি যুক্তি-প্রমাণের কোষ্ঠীপাথরে (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী) পরীক্ষিত, পরিশীলিত না হয়ে আনকোরা অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, তাহলে তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারা প্রসূত "সিদ্ধান্ত" ভ্রান্ত হতে বাধ্য। এখানে খুব সংক্ষেপে বলা যায় যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বা বিজ্ঞানমনস্কতা বলতে বোঝায়- সংস্কারমুক্ত, সংগঠিত-সংশয়বাদী, অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি-প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল এবং আপ্তবাক্য বা উপাসনাধর্মীয় আবেগ দ্বারা পরিচালিত না হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী।

(৬) অস্বীকার করা যাবে না, আজ উপাসনাধর্মগুলো অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির সাথে একাকার হয়ে গেছে। এগুলো থেকে উপাসনাধর্মকে আলাদা করা খুবই কষ্টসাধ্য। আমাদের সমাজে আমরা কেউ মানুষ নামে পরিচতি নই, কেউ মুসলিম, কেউ হিন্দু, কেউ খ্রীষ্টান, কেউ বৌদ্ধ ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন কাজে ফরম পূরণ করতে হলে পরিচয় হিসেবে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ইত্যাদি যে যেটা বংশপরম্পরায় লাভ করেছে (কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করল কি, করলো না তা মূখ্য নয়), তাই লিখে দিতে হয়। তাহলে কী বলা যায় না মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি করে দিয়েছে, দূরত্ব তৈরি করেছে ঘৃণার বিষবাস্প তৈরি করেছে উপাসনাধর্ম। হুঁ, এটাও সত্যি যে সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতির কারণে মানুষ মানুষে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে, ধনী-গরীবে পার্থক্য তৈরি হচ্ছে, আঞ্চলিকতার বিকাশ ঘটছে। কিন্তু এই বৈষম্যরোধ করতে হলে কেন শুধুমাত্র উপাসনাধর্ম কে এড়িয়ে গিয়ে বাকি অন্যগুলোকে

ভাঙ্গতে হবে। একটাকে জিইয়ে রেখে কী আমরা মানুষের-সমাজ গঠন করতে পারবো? না কী, মুসলিম সমাজ, হিন্দু সমাজ, খ্রীষ্টান সমাজ, বৌদ্ধ সমাজ নামধারী আলাদা আলাদা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন তৈরি হবে?

(৭) ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই, যে সকল উপাসনাধর্মগুলো রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে কিংবা বলা যায় রাষ্ট্র (শাষক গোষ্ঠী) কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তারাই আজ প্রবল বিক্রমে বেঁচে রয়েছে (যেমন- ইসলাম, হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ নামক উপাসনাধর্মগুলো)। কিন্তু যারা কখনও রাষ্ট্রীয় বা শাষকগোষ্ঠী কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা পায় নি, তাদের কতিপয় যক্ষা রোগীর ধুকে ধুকে মরতে বসেছে কিংবা এরই মধ্যে মরে গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় জৈন উপাসনাধর্ম সহ আদিবাসীদের নানা উপাসনাধর্ম। তাই বলা যায়, আজকের পরাক্রমশালী সব উপাসনাধর্মগুলো নানা সময়ে সমাজপতি, গোষ্ঠীপতি, রাষ্ট্রীয় কর্ণধারের আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়েছে, আর একে ব্যবহার করেছেন নিজেদের শাষণ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে, মানুষের মধ্যে সস্তা ভাবাবেগ তৈরি করতে, অন্ধবিশ্বাস- কুসংস্কার বোধ জাগ্রত করতে, মানুষে-মানুষে বিভেদ তৈরি করতে। একটু চাঁচাছালো ভাষায় বলতে গেলে, আমাদের সমাজের রাজনৈতিক নেতারা, ঠাকুর, মোল্লারা উপাসনাধর্মকে কনডম বানিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে আমজনতাকে ধর্ষন করে চলছেন।

> এখন, ভ্রান্তবিশ্বাস বোধে আচ্ছন্ন মানুষকে উপাসনাধর্ম নামক "লোক ঠকানো ব্যবসা" থেকে সজাগ করা, দূরে রাখা কী অন্যায়। সাদা কে সাদা আর কালো কে কালো বলা অন্যায়?

(৮) উপাসনাধর্মগুলোকে যারা প্রচার করেছেন, তাঁদেরকে তাঁদের অনুসারীরা "মহাপুরুষ" হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। **এই পৃথিবীতে নানা সময়ে নানা মহাপুরুষের (!) আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু কোনো মহানারী'র আবির্ভাব ঘটতে দেখি নি। কারণটা কী?** হয়তো কোথাও তথাকথিত মহাপুরুষের অনুগত হিসেবে কতিপয় নারী এগিয়ে এসেছিলেন কিন্তু কোনো উপাসনাধর্মের প্রচারক হিসেবে "মহানারী" আছেন কী। কেউ কী জানাবেন আমাকে, আমি জানি না।

(৯) "মহাপুরুষ" বলতে কী বোঝায়? যারা স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদি অর্থাৎ প্রচলিত সমাজব্যবস্থার উর্ধ্বে উঠে চিন্তা করতে পারেন, এবং সেই চিন্তা বাস্তবায়ন করতে পারেন। কিন্তু আমাদের সমাজ যাদের মহাপুরুষ হিসেবে ঘোষনা করে থাকে, তাঁদের ব্যক্তিজীবন দেখলে কী এরকম কোনো উদাহরণ পাওয়া যায়? এরা প্রত্যেকেই (শ্রীকৃষ্ণ থেকে রসুল) তো রঙ্গালীলা আর রসলীলা'য় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। প্রচলিত স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজেদের কাম চরিতার্থ করেছেন। হয়তো কারো কারো তুখোড় রাজনৈতিক জ্ঞান ছিলো, এবং হত্যা, যুদ্ধ, ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাকাঠামো দখল করে সেই রাজনৈতিক জ্ঞান প্রয়োগ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের কারো মধ্যে বিন্দু মাত্র অলৌকিকতার ছোঁয়া ছিলো না। বরঞ্চ শোনা যায় কারো কারো নাকি মৃগী রোগ থেকে মানসিক ভারসাম্যহীনতারও লক্ষণ ছিল। তবে প্রত্যেকেই ছিলেন কামুক চরিত্রের; এবং কাম-এর বলি হয়েছেন কত শত নারী, ইতিহাসই এর সাক্ষী। শুধুমাত্র "মহাপুরুষ" আজ বেঁচে নেই বলে কিংবা উপাসনাধর্মালম্বীদের অনুভূতিতে আঘাত লাগবে বলে, তাদের ঘৃণ্য কৃত কাজের সমালোচনা করা যাবে না? এতে কী পরোক্ষভাবে তথাকথিত "মহাপুরুষ"-দের যৌন উছৃঙ্খলতা সমর্থন দেয়া হয় না? সভ্যতার কী কোন ভব্যতা আমাদের মধ্যে আজ অবশিষ্ট নেই? কেউ কেউ উপদেশ দিয়ে থাকেন, এই সকল মহাপুরুষদের বিবেচনা করতে হবে, তাদের নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে। হাস্যকর যুক্তি। এঁদের একদিকে মহাপুরুষ বলে দাবি করা হয়, আবার স্থান, কাল,

পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়। তাহলে কীসের মহাপুরুষ? প্রত্যেকেরই চরিত্র তো দেখি লাম্পট্যে ভরপুর।

(১০) কেউ কেউ বলে থাকেন, উপাসনাধর্ম আর উপাসনাধর্মীয় মৌলবাদ আলাদা জিনিষ। মৌলবাদ-এর সমালোচনা করা যায় কিন্তু উপাসনাধর্মকে নয়। কিন্তু উপাসনাধর্মের সৃষ্টি, চরিত্র, ব্যবহার ও অনুসরণের মধ্যেই তো উপাসনাধর্মান্ধতা ও উপসনাধর্মীয় মৌলবাদের বীজ নিহিত রয়েছে। কম-বেশি মৌলবাদী না হলে উপাসনাধর্ম রক্ষা হয় না। যেমন কোন হিন্দু যদি বলতে শুরু করেন, বেদ আসলে মানুষের তৈরি করা কাল্পনিক কিছু প্রকৃয়া, চতুর্বর্ণ প্রথা অপ্রয়োজনীয় ও বর্জনীয়, ঈশ্বর আসলে মানুষের কল্পনাজাত ইত্যাদি তবে তিনি আর যাই হোক হিন্দু থাকেন না। তিনি উপাসনাধর্মীয় সংস্কারক হতে পারেন বা অন্য নতুন কোন উপাসনাধর্ম মতের সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু সনাতন হিন্দুত্ব বলতে যা যা বৈশিষ্ট্য বোঝায় তা আর ঐ ব্যক্তির মধ্যে থাকে না; অর্থাৎ প্রাচীন মূল কিছু বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখতেই হয়। এটি অন্য সব উপাসনাধর্ম-এর ক্ষেত্রে সত্য। যেমন- ইসলামে কোরাণকে আল্লাহর বাণী ও মোহাম্মদকে শেষ নবী বলে স্বীকার করতেই হবে, খ্রীষ্টধর্মে জেসাসকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করতেই হবে এবং মরিয়মকে কুমারী ভেবে জেসাসের মাতা বলে স্বীকার করতেই হবে। এখন কোন মুসলমান যদি বলেন যে মুহাম্মদ আসলে তখনকার সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামরিক বিকাশের জন্য কোরান হচ্ছে অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থের সন্নিবেশে মুহাম্মদেরই চেষ্টায় আরো কয়েকজনের সহযোগীতায় একটি সংকলন, তবে প্রকৃত অর্থে ঐব্যক্তিকে আর মুসলমান বলা চলে না। এই মূল কিছু ব্যাপারকে অবশ্যই মান্য করা যেমন বিশেষ উপাসনাধর্মের স্বাতন্ত্র্য ও তথাকথিত মাহাত্ম্যের জন্য অত্যাবশ্যক, তেমনি কেউ যখন নিজেকে বিশেষ উপাসনাধর্মাবলম্বী বলে পরিচিতি করান বা বিশ্বাস করেন, তার মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, যুক্তিহীন আবেগ কম-বেশি থাকেই। তাই যাঁরা বিশেষ সব উপাসনাধর্মকে টিকিয়ে রেখে উপাসনাধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের বিরোধীতা করতে চান, তারা লেখক ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু (সূত্র :- মানব সন্তান ঈশ্বর ও অন্যান্য প্রসঙ্গ; উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা-৭০০০০৭। পৃষ্ঠা- ১৭)'র ভাষায়-

> "...তাঁরা হয় অসচেতনভাবে আত্মপ্রতারিত মানবতাবাদী অথবা সচেতনভাবে বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারী ধান্দাবাজ। যদি সত্যিই মানুষ ও তার সমাজের মঙ্গল কেউ চান তবে তাঁকে ধর্মীয় পরিচয়মুক্ত হতেই হবে এবং অন্যদেরও যুক্তি, তথ্য, সত্য ও ধৈর্য নিয়ে এই সংকীর্ণ পরিচয়ের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতেই হবে ; ধর্মের মানবিক প্রসাঙ্গিক মূল্যবোধগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনায় গ্রহণ করে বাকীগুলিকে নির্দ্বিধায় বিসর্জন দিতেই হবে। ....."

(১১) নাস্তিকদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের মধ্যে একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়, সেটা হলো নাস্তিকদের চিন্তাভাবনা প্রচলিত সমাজের গণমানুষের চিন্তাভাবনা'র সাথে মিল নেই। নাস্তিকদের কাজই তো নিজেদের চিন্তাভাবনাকে গণমানুষের চিন্তাভাবনায় রূপান্তরিত করা, না হলে কীসের নাস্তিক? কীসের বিরুদ্ধে স্রোতের যাত্রী? আসলে বেশীর ভাগ অভিযোগ করা হয় শুধুমাত্র অভিযোগ করার জন্য করা, যুক্তি তেমন থাকে না। এসকল অভিযোগ শুনলে পাল্টা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, এখানে গণমানুষ বলতে প্রশ্নকর্তা কাদের বোঝাচ্ছেন? শাষকগোষ্ঠী, বুদ্ধীজীবি, চাটুকারদের কী তিনি এই গণমানুষ বোঝাচ্ছেন? তারপরও তিনি যাদেরই বোঝান না কেন সমাজ-সভ্যতার ক্রমবিকাশে কোন মহৎ চিন্তাটি বা কর্মটি সর্বপ্রথমে সকল গণমানুষ একত্রে ঠিক করেছে? বরঞ্চ বলা যায়, সর্বক্ষেত্রে গণমানুষেরা যেকোনো নতুন কিছু করতে গেলে বাধা সৃষ্টি করেছে, গোল বাধিয়েছে। শাষকগোষ্ঠীর চাটুকার আর দালালদের প্ররোচণায় "গেল গেল" রব তুলেছে। পরবর্তীতে মহৎ কর্মের ফসলের ভাগ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘরে গিয়ে ঘুম দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আধুনিককালে রেললাইন প্রচলন করতে, নলকূপ বসাতে গিয়ে,

টেলিভিশন নিয়ে, ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে গিয়ে প্রথম দিকে কী লঙ্কাকান্ডই না ঘটিয়েছে তথাকথিত গণমানুষের দল। আবার এই পৃথিবীতে একলক্ষ চব্বিশ/চল্লিশ কিংবা দুই লক্ষ চব্বিশ/চল্লিশ জন তথাকথিত পয়গম্বর জন্মেও আমাদের সমাজ সভ্যতার জন্য কিছুই করতে পারেন নি তার থেকে সহস্র-সহস্র-সহস্রগুন বেশি মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন একজন এপিকিউরাস, একজন সক্রেটিস, একজন কোপার্নিকাস, একজন জিওরদানো ব্রুনো, একজন গ্যালিলিও, একজন কার্ল মার্ক্স, একজন ডারউইন, একজন আইনস্টাইন। তাঁদের আর পুনর্বার জন্মগ্রহণের প্রয়োজন নেই।

সবশেষে বলতে ইচ্ছে করে রবি ঠাকুরের ভাষায় -
হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।
যে পূঁজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে-
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

.....চলতে পারে.....

-o-

যোগাযোগ : ananta_atheist@yahoo.com